বেহুলা-লখিন্দরের অমর ভালোবাসার গল্প

তেরো শতক থেকে আঠারো শতকের মাঝে কোনো এক সময়ে জন্ম হয় বেহুলা ও লখিন্দরের কাহিনীর। মনসা-মঙ্গল কাব্যে সর্বপ্রথম এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের ভালোবাসার গল্প বাংলার মানুষের মুখে মুখে ফেরে। পাড়ায় পাড়ায় আড্ডার ফাঁকে বহু মানুষ রোমন্থন করেছে এই কাহিনী। শ্রোতারা আগেও অনেকবার এই কাহিনী শুনেছেন, কিন্তু তারপরও তারা শুনে যান; যতই শোনা হোক, আবারও শুনতে ইচ্ছে করে। কিছু কিছু কাহিনী আছে, যেগুলো কখনোই পুরনো হয় না, শুনতে কখনোই ক্লান্তি আসে না। বেহুলা ও লখিন্দরের প্রেমগাঁথাও এমনই এক অমর কাহিনী।

বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী জানতে হলে যেতে হবে এর গভীরে, পৌঁছাতে হবে একদম দেবলোকে। দেবতা শিবের কন্যা ছিলেন মনসা। মর্ত্যলোকের সকলে শিবকে পূজা করতো, ভক্তি করতো। সাপের দেবী হবার কারণে কেউই মনসাকে পূজা করতো না। এতে তার দেবীত্বের দিক থেকে প্রশ্ন দেখা দেয়। এমন অবস্থায় দেবতা শিব তার কন্যাকে একটি সমাধান দিলেন। কোনো ভক্তিমান শৈবকে যদি পূজা করার জন্য কোনোভাবে রাজি করানো যায়, তাহলে মর্ত্যলোকে তার পূজার প্রচলন করা যাবে। যারা শিবকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে পূজা করে, তাদেরকে বলা হয় শৈব।

চম্পকনগর এলাকার চাঁদ সদাগর ছিলেন শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনিই লখিন্দরের বাবা। দেবী মনসা পূজা কামনার জন্য তাকে নির্বাচন করলেন। কিন্তু চাঁদ সদাগর তাকে পূজা করতে অস্বীকৃতি জানান। যিনি মহান দেবতা শিবের পূজা করেছেন, তিনি কীভাবে সর্পের দেবীকে পূজা করবেন? এ কথা শুনে মনসা ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন এবং পদে পদে তার ক্ষতি করতে থাকেন। ছলে-বলে তার কাছ থেকে পূজা আদায় করার চেষ্টা চালিয়ে গেলেও প্রতিবারই ব্যর্থ হন। কারণ চাঁদ সদাগরের কাছে ছিল দেবতা শিবের বিশেষ মন্ত্র। এই মন্ত্রের প্রভাবে সকল ছলনা পেরিয়ে আসেন তিনি।

এক পর্যায়ে মনসা যখন দেখলেন, এভাবে কাজ হচ্ছে না; তখন অন্য এক অপ্সরী নারীর রূপ ধরে অর্ধনগ্ন অবস্থায় তিনি আসলেন চাঁদ সদাগরের কাছে। চাঁদ সদাগর তাকে ছুঁতে চাইলে অপ্সরী তাকে বললেন, বিশেষ ঐ মন্ত্রটা তাকে বলতে হবে। চাঁদ সদাগর তাকে মন্ত্র বলে দিলেন। তখন ছদ্মবেশ ছেড়ে আসল রূপে এসে মনসা বললেন, তাকে পূজা করতে। মন্ত্র এখন আর চাঁদ সদাগরের কাছে নেই, বলে দেওয়ার কারণে মন্ত্র চলে গেছে মনসার কাছে। এখন তাকে কোন দিব্যি বাঁচিয়ে রাখবে?

চাঁদ সদাগরের এক বন্ধু ছিল, নাম শংকর। তিনি আবার তন্ত্র-মন্ত্র জানতেন। নিজের ঐশ্বরিক মন্ত্র হারিয়ে শংকরের সাহায্য নেন চাঁদ। শংকরের মন্ত্রও বেশিদিন টেকেনি। অধিক শক্তিশালী মন্ত্র দিয়ে শংকরকে মেরে ফেলেন মনসা। আবারো সাহায্যহীন হয়ে পড়েন চাঁদ। এরপরও মনসাকে পূজা করতে অস্বীকৃতি জানালে, মনসা ক্রুদ্ধ হয়ে তার সন্তানদেরকে একে একে মেরে ফেলতে লাগলেন। গৃহপালিত পশুগুলোকেও ছাড় দেননি মনসা। প্রতি পদে পদে এমন অবিচারের ফলে চাঁদ সদাগর সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেলেন, একপর্যায়ে ভিক্ষাবৃত্তিও শুরু করেন। তারপরও শিবের পূজা ছেড়ে সাপের পূজা করেননি তিনি।

বাণিজ্য করতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে আবার চম্পকনগর ফিরে আসার পর চাঁদ সদাগরের একটি সন্তানের জন্ম হয়, যার নাম লখিন্দর। একই সময়ে তার বন্ধু সাহার ঘরেও একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়, তার নাম বেহুলা। কোনো কোনো এলাকায় প্রচলিত আছে, চাঁদ সদাগরের সাথে না পেরে মনসা নিজেই চক্রান্ত করে তাদেরকে জন্মগ্রহণ করান। দেবী যখন দেখলেন কোনোকিছুতেই তিনি চাঁদের কাছ থেকে পূজা অর্জন করতে পারছেন না, তখন তিনি স্বর্গের দুজন নর্তক-নর্তকীর সাহায্য নেন। চুক্তি করেন যে, পৃথিবীতে তারা একজন বেহুলা ও আরেকজন লখিন্দর হিসেবে জন্মলাভ করবে এবং চাঁদ সদাগরের কাছ থেকে পূজা আনিয়ে দেবে।

দুই শিশু একই সাথে বড় হতে থাকে। অন্যদিকে মনসারও শাপ ছিল, পূজা না করলে চাঁদ সদাগরের সকল সন্তানকে বিষ ছোবলে মেরে ফেলা হবে। পিতা-মাতারা তাদের বিয়ের কথা ভাবলেন এবং কোষ্ঠী গুণে দেখলেন, বাসর রাতে লখিন্দরকে সাপে কাটবে। ওদিকে বেহুলার কোষ্ঠী গুণে তারা দেখলেন, বেহুলা কখনো বিধবা হবে না। আর তাছাড়া তারা দুজনই মনসাকে পূজা করে, তাই মনসা হয়তো তাদেরকে মেরে ফেলবেন না, এই ভেবে তারা তাদেরকে বিয়ে করিয়ে দিলেন।

কিন্তু তারপরেও ভয় থেকে যায়। এর আগে যেখানে ছয়টি সন্তানকে মেরেছেন দেবী, এটিকেও যে মারবেন না, তার নিশ্চয়তা কী? তাই চাঁদ সদাগর লখিন্দরের বেলায় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করলেন। অত্যন্ত দুর্ভেদ্য এক লৌহপ্রাচীর নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন তিনি, বেহুলা-লখিন্দরের বাসর রাতের জন্য। এই প্রাচীরে সামান্যতম ছিদ্রও থাকবে না, যা দিয়ে কোনো সাপ প্রবেশ করতে পারবে।

কিন্তু এখানেও একটু ত্রুটি থেকে যায়। লৌহপ্রাচীর নির্মাণ করেন বিশ্বকর্মা নামে একজন কারিগর। মনসা দেবীর চাপে তিনি লৌহপ্রাচীরে ছোট একটি ছিদ্র রেখে দেন। কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচলিত আছে, তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল, যদি ছোট একটি ছিদ্র না রাখা হয়, তাহলে তার পরিবারের সকলকে সাপের বিষে মেরে ফেলা হবে। নির্ধারিত দিন আসলো, বাসর হলো। বাসরের রাতে মনসা দেবী কালনাগিনীকে প্রেরণ করেন লৌহপ্রাচীরে। কালনাগিনী হলো সাপেদের মধ্যে সবচেয়ে বিষাক্ত। বেহুলা সারারাত জেগে থেকে স্বামীকে পাহারা দেবেন বলে মনস্থ করলেন। কিন্তু মনসা তার শক্তিশালী মন্ত্র দিয়ে তাকে ঘুমে তলিয়ে দিলেন। নাগিনী এসে দেখে, বেহুলা ঘুমিয়ে গেলেও তার স্বামীকে এমনভাবে সুরক্ষা দিয়ে রেখেছে যে, শরীরের কোনো অংশেই দংশন করার উপায় নেই। তবে সামান্য অসতর্কতা থেকে গিয়েছিল। বাসর শয্যা থেকে বেহুলার চুলগুলো ঝুলছিল নিচের দিকে। চুল বেয়ে উঠে যায় কালনাগিনী। দংশন করে লখিন্দরকে। এতে প্রাণ চলে যায় তার।

তখনকার নিয়ম ছিল, কোনো ব্যক্তিকে সাপে কাটলে ভেলায় ভাসিয়ে দিতে হবে। ভাগ্য প্রসন্ন হলে কোনো একভাবে বেঁচেও ফিরতে পারে সেই সাপে কাটা ব্যক্তি। মানুষের ধারণা ছিল, সাপে কাটলে কোনো কোনো সময় প্রাণ চেপে থাকে শরীরের ভেতর, ভেলায় ভাসিয়ে দিলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই প্রাণ আবারো সচল হতে পারে দেহে। নিয়ম অনুসারে লখিন্দরকেও ভাসিয়ে দেয়া হলো ভেলায়। ভেলায় সাধারণত সাপে কাটা ব্যক্তিকেই ভাসানো হয়, অন্য কাউকে নয়। কিন্তু বেহুলা এখানে একটি প্রবল সাহসী কাজ করে ফেললেন। তিনি নিজেও ভেলাতে চড়ে বসলেন। অন্যান্যদের কোনো মানাই মানেননি তিনি।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ভেলা ভেসে বেড়ায় আর লখিন্দরের মৃতদেহে পচন ধরতে থাকে। গ্রামের পর গ্রাম পেছনে যেতে থাকে, আর গ্রামবাসীরা তাকে পাগল ঠাহর করতে থাকে। তবে কোনোকিছুতেই বেহুলা আশা ছেড়ে দেন না। মনসার কাছে প্রার্থনা করতেই থাকেন। শুধুমাত্র ভেলাটিকে ভাসিয়ে রাখা ছাড়া আর কোনো প্রকার সাহায্যই করেন না মনসা দেবী।

ছয় মাস ধরে ভাসতে থাকে ভেলাটি। ভাসতে ভাসতে একসময় মনসা দেবীর পালক মাতা নিতার গ্রামে আসে। নিতা তখন ঘাটে কাপড় কাচছিলেন। নিতা কীভাবে মনসার পালক মাতা হয় সে আবার আরেক কাহিনী, পরবর্তীতে কোনো একসময় সে গল্প বলবো। বেহুলার নিরবিচ্ছিন্ন প্রার্থনা ও স্বামীর প্রতি ভালোবাসা দেখে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, তাদেরকে স্বর্গলোকে মনসার কাছে নিয়ে যাবেন। তিনি তার অলৌকিক ক্ষমতা ব্যবহার করে স্বামী ও স্ত্রীকে স্বর্গলোকে মনসার কাছে নিয়ে গেলেন। মনসা তখন বললেন, বেহুলা তার স্বামীর জীবন ফিরে পাবে, তবে তার জন্য একটি কাজ করতে হবে, চাঁদ সদাগরকে মনসার পূজা দেবার জন্য রাজি করাতে হবে। বেহুলা সম্মতি দিলেন, যেকোনো মূল্যে চাঁদ সদাগরকে রাজি করাবেন। তারপর প্রাণ ফিরে পেলো লখিন্দর। চোখ মেলে তাকালো বেহুলার দিকে। সুন্দর করে হাসি দিলো। আর পচে যাওয়া দেহও স্বাভাবিক হয়ে গেল। নিতা তাদেরকে আবার মর্ত্যে পৌঁছে দিলেন।

মর্ত্যে পৌঁছে সব ঘটনা খুলে বললে, চাঁদ সদাগর আর মনসার পূজার ব্যাপারে না করতে পারলেন না। তবে মনসা তাকে এত কষ্ট দিয়েছিলেন যে, তখনো রাগ রয়ে গিয়েছিল চাঁদ সদাগরের। তিনি পুরোপুরি ক্ষমা করতে পারেননি মনসাকে। পূজা দেবার সময় বাম হাতে পূজা দিতে থাকেন তিনি। তা-ও আবার মূর্তির দিকে তাকিয়ে নয়, পেছন ফিরে উল্টোভাবে। তবে মনসা তাতেই খুশি হন এবং তার দেবীত্ব পূর্ণতা লাভ করে। তারপর থেকেই মর্ত্যলোকে মনসা দেবীর পূজার প্রচলন শুরু হয়। ফলাফলস্বরূপ, চাঁদ সদাগরের বাকি ছয় পুত্রের জীবনও ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি হরণ করা সম্পদগুলোও ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে বেহুলা-লখিন্দর ও চাঁদ সদাগরের পরিবার সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করতে থাকে।